ইউনিট ৭
জাতীয় আয়

ভূমিকা

জাতীয় আয় অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন দেশের সমৃদ্ধি জাতীয় আয়ের মাধ্যমে বিচার করা হয়। কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান যেমন তার ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভর করে, তেমনি একটি দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান সে দেশের জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে। জাতীয় আয়ের পরিমাণ একটি দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। তাই একটি দেশের মোট উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে জাতীয় আয়ের ধারণাটি বুঝতে সহজ হবে। এ ছাড়া যেহেতু ব্যক্তির আয়ের উপর তার জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তাই মাথাপিছু আয়ের ধারণার সাথে আমাদের পরিচয় থাকা প্রয়োজন। জাতীয় আয় বাড়লে মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ে। আলোচ্য পাঠে জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়, বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পাঠ ১ : জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় উৎপাদন সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাতীয় আয়ের বিবরণ দিতে পারবেন।
- জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

জাতীয় উৎপাদন

উৎপাদন সম্পর্কে আমরা পূর্বের ইউনিটে জেনেছি। এবার আসুন জাতীয় উৎপাদন কি, সে সম্পর্কে জেনে নিই। একটি দেশের অধিবাসীরা সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে। কোন দেশ এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তাকে সে দেশের জাতীয় উৎপাদন বলা হয়। যেমন– কৃষক কৃষিপণ্য উৎপাদন করে, শ্রমিক কারখানায় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে, খনির শ্রমিক খনি হতে খনিজদ্রব্য উৎপাদন করে, শিক্ষক শিক্ষকতা করে, ডাক্তার রোগী দেখে ইত্যাদি। এসব কাজকর্মের ফলে **কোন দেশে এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তাদের সমষ্টিকে মোট জাতীয় উৎপাদন বলে।**

উৎপাদন চলার সময় কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রমশ পুরাতন ও অকেজো হয়ে পড়ে, অর্থাৎ অবচয়ের সৃষ্টি হয়। কিন্তু উৎপাদন চালু রাখতে হলে এগুলো মেরামত করা বা বদলানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মোট জাতীয় উৎপাদন হতে এসব ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।

জাতীয় আয়

আমাদের দেশে ইটের ভাটায় উৎপাদিত একটি ইটের কথাই ধরুন। এই ইটটির একটি মূল্য আছে। অর্থাৎ অর্থ দিয়ে এটিকে ক্রয় করতে হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় উৎপাদনেরও মূল্য আছে। আর **কোন দেশের শ্রম ও মূলধন সে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সৃষ্টি করে তার মোট আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।** জাতীয় আয় হিসাব করার সময় মোট জাতীয় আয় হতে যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, প্রভৃতির ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয়, বৃদ্ধ বয়সের ভাতা, বে-আইনী কার্যকলাপের মাধ্যমে অর্জিত আয়, দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের আয় বাদ দিতে হয় এবং উক্ত দেশের নাগরিকদের বিদেশ হতে প্রাপ্ত আয় যোগ করতে হয়। তাছাড়া জাতীয় আয় হিসাবের সময় একই দ্রব্যের দাম যাতে দুবার যোগ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। যেমন, বইয়ের দাম হিসাবের সময় কাগজের দাম যাতে আলাদাভাবে ধরা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য

জাতীয় আয় এবং জাতীয় উৎপাদন– এই ধারণা দুটি পরস্পর এক নয়। সাধারণত জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য দেখা যায় :

১। কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) কোন দেশের মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কর্মের সমষ্টিকে জাতীয় উৎপাদন বলে। জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

২। জাতীয় আয়ের ধারণা কিছুটা সংকীর্ণ কিন্তু জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটা ব্যাপক। জাতীয় উৎপাদন হিসাব করার সময় মূলধন দ্রব্যের (যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ ইত্যাদির) ক্ষয়-ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দেওয়া হয় না। জাতীয় আয় হিসাব করার সময় এ ব্যয় বাদ দেওয়া হয়।

৩। জাতীয় উৎপাদন বস্তু ও সেবার পরিমাণ বা অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু জাতীয় আয় শুধু অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

মাথাপিছু আয়

পৃথিবীর দরিদ্রতম অঞ্চলগুলোর অন্যতম দক্ষিণ এশিয়া। বিশ্বের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ২২ ভাগ দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে। কিন্তু বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেকের বাস এই দক্ষিণ এশিয়ায়। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের মাথাপিছু আয় খুবই কম। কোন দেশের মানুষের গড় জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ধারণা করতে হলে মাথাপিছু আয়ের হিসাব করতে হবে। তাই মাথাপিছু আয় কাকে বলে সেটা জানা প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোন দেশের মোট জাতীয় আয়কে মোট জনসংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়।

$$\text{মাথাপিছু আয়} = \frac{\text{মোটি জাতীয় আয়}}{\text{দেশের জনসংখ্যা}}$$

সাধারণত মাথাপিছু আয় দ্বারা কোন দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান নির্ধারণ করা হয়।

সারসংক্ষেপ

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) কোন দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের সমষ্টিকে জাতীয় উৎপাদন বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন হতে ক্ষয়-ক্ষতি বাবদ বরাদ্দ অর্থ বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়।
- জাতীয় উৎপাদনের আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। জাতীয় উৎপাদন কাকে বলে?
- ক. এক বছরে কোন দেশে মোট উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা
- খ. একটি দেশে উৎপাদিত যাবতীয় ভোগ্য দ্রব্য
- গ. একটি জাতির ধন সম্পত্তি ও ভূখন্ড
- ঘ. একটি দেশের জনগণের আয় ও বৈদেশিক সাহায্য

২। জাতীয় আয় কাকে বলে?
- ক. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবা কর্মের বিক্রয়লব্ধ অর্থ
- খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ
- গ. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য
- ঘ. রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়

৩। জাতীয় আয় কিসের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়?
- ক. দ্রব্যের পরিমাণের মাধ্যমে
- খ. অর্থের মাধ্যমে
- গ. দ্রব্যের পরিমাণ ও সেবাকর্মের মাধ্যমে
- ঘ. উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়লব্ধ অর্থের মাধ্যমে।

৪। জাতীয় উৎপাদন কিসের সাহায্যে সৃষ্টি হয়?
ক. প্রাকৃতিক সম্পদের সাহায্যে
খ. উৎপাদনের উপকরণের সাহায্যে
গ. প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রম, মূলধন ও সংগঠনের সাহায্যে
ঘ. সংগঠনের সাহায্যে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। জাতীয় উৎপাদন, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় কাকে বলে বর্ণনা করুন?
২। জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞা লিখুন?
২। জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিন।

পাঠ ২ : বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা, উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ও তাদের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এ পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারবেন।
- বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশের কৃষিদ্রব্য, শিল্পদ্রব্য ও খনিজদ্রব্যের বিবরণ দিতে পারবেন।

বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা

বাংলাদেশ পৃথিবীর অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের অর্থনীতি এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। এখানকার উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি ভিত্তিক। আমাদের জাতীয় আয়ে কৃষির অবদান এখনও এককভাবে সবচেয়ে বেশি। রপ্তানি বাণিজ্যে এই খাতের অবদান অন্যান্য খাতের তুলনায় বেশি। এদেশের কর্মক্ষম লোকের সিংহভাগ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত। কৃষির তুলনায় অন্যান্য খাতের উল্লেখযোগ্য বিকাশ আমাদের দেশে এখনও সম্ভব হয়নি। তাই জাতীয় আয়ে শিল্প ও অন্যান্য খাতের অবদান খুবই নগণ্য। অথচ শিল্পের উন্নতি ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। মূলধনের অভাব, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, বিনিয়োগের পরিবেশের অভাব প্রভৃতি আমাদের দেশের শিল্পের উন্নয়নের পথে বাধা হিসেবে কাজ করছে। বর্তমানে এ দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যুগোপযোগী অর্থাৎ শিল্পভিত্তিক করার চেষ্টা চলছে।

উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ও তাদের শ্রেণীবিভাগ :

বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– ১। কৃষিজাত দ্রব্য; ২। শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। খনিজ দ্রব্য।

১। কৃষিজাত দ্রব্য :

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বেশিরভাগ লোক জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদেশ পলিগঠিত সমভূমি বলে এদেশের মাটি খুবই উর্বর। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ ১.৪ কোটি হেক্টর। এর মধ্যে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ৯০ লক্ষ হেক্টর। পল্লী এলাকার শতকরা ৮০ ভাগ লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে এই কৃষিখাতে। জাতীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ এ খাত থেকে আসে। তাই জাতীয় অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব এত বেশি।

বাংলাদেশের কৃষিদ্রব্যসমূহকে চার ভাগে ভাগ করা যায়: যথা– ১। শস্য; ২। বন;
৩। পশুপালন ও ৪। মৎস্য।

১। শস্য : বাংলাদেশে উৎপাদিত শস্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল। যেসব শস্য খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাকে খাদ্যশস্য বলে। আর যেসব শস্য বাণিজ্যিক ভিত্তিতে (অর্থাৎ বাজারে বিক্রি বা বিদেশে রপ্তানি করার জন্য) উৎপাদন করা হয় তাকে অর্থকরী ফসল বলে। বাংলাদেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে চাউল, ডাল, গম, আলু, তৈলবীজ, নানারকম ফল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশের মোট আবাদি জমির শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ জমিতে খাদ্যশস্য উৎপাদন করা হয়। এছাড়া পাট, চা, আখ, তামাক, তুলা, রেশম প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল।

২। বন : বন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কারণ ভূমির ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন। বাংলাদেশের মোট আয়তনের শতকরা ১৩ ভাগ বনভূমি রয়েছে। বাংলাদেশের বনভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়; যথা– ১। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি; ২। সিলেটের বনাঞ্চল; ৩। সুন্দরবন; ৪। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং ৫। দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি।

বাংলাদেশের বনভূমিতে যেসব বৃক্ষ দেখা যায় তার মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গর্জন, সেগুন, চাপালিস, গামারি, শিরীষ, শাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সুন্দরবনে গোলপাতা এবং সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌকা, রেলওয়ের স্লিপার, খুঁটি প্রভৃতি তৈরিতে এসব গাছের কাঠ

ব্যবহার করা হয়। বন থেকে আমরা জ্বালানি কাঠও পেয়ে থাকি। বন হতে মধু, মোম, গোলপাতা, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।

৩। পশুপালন : আমাদের অর্থনীতিতে পশুসম্পদ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পশুসম্পদের অধিকাংশই গৃহপালিত পশু। এর মধ্যে গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া হাঁস, মুরগি, কবুতর প্রভৃতি পাখিও গৃহে পালন করা হয়। প্রাণিজ আমিষ, যেমন– দুধ, মাংস ও ডিম গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগি হতে পাওয়া যায়। হালচাষ, গ্রামীণ পরিবহন, শস্য মাড়াই প্রভৃতি কাজে পশু ব্যবহার করা হয়। দেশের চাষযোগ্য জমির প্রায় সবটুকুই গবাদি পশু দ্বারা চাষ করা হয়। গবাদিপশুর চামড়া রপ্তানি করে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। গ্রামীন জনগণের এক বড় অংশ হাঁস, মুরগি, গরু ও ছাগল পালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাদের দেশের গ্রামের গরিব, বেকার ও দুঃস্থ মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহিত করতে পারলে অতিরিক্ত কাজের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এর ফলে বেকারদের স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি হবে।

৪। মৎস্য : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মাছ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এদেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুর। এছাড়া সমুদ্র হতেও মাছ পাওয়া যায়। দেশের ভিতরের জলাশয় থেকে যে মাছ পাওয়া যায় তাকে মিঠা পানির মাছ বলে। সমুদ্র থেকে যে মাছ পাওয়া যায় তাকে লোনা পানির বা সামুদ্রিক মাছ বলে। মিঠা পানির মাছের মধ্যে রয়েছে- রুই, কাতলা, মৃগেল, মাগুর, সরপুটি, পাঙ্গাস, ইলিশ, চিতল, বোয়াল, কই, সিং প্রভৃতি। সামুদ্রিক মাছের মধ্যে রয়েছে- চাঁদা, রূপচাঁদা, ভেটকি, গলদা চিংড়ি প্রভৃতি। দেশে বছরে প্রায় ৮ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপন্ন হয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও গ্রামীণ জনগণের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রায় ১২ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে মাছ ধরে জীবিকা অর্জন করে। মাছ দেশের প্রাণিজ আমিষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ করে।

শিল্পজাত দ্রব্য :

বাংলাদেশে উৎপাদিত শিল্পজাত দ্রব্যসমূহকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্য, ২। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাতদ্রব্য এবং ৩। কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

বাংলাদেশের বৃহদায়তন শিল্পের মধ্যে পাট, বস্ত্র, চিনি, কাগজ, সিমেন্ট, সার, লৌহ ও ইস্পাত, দিয়াশলাই, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের মধ্যে পোশাক শিল্প, চামড়া ট্যানিং, জুতা তৈরি, ডেয়ারি ফার্ম, বেকারি, চাল ও আটার কল, হোসিয়ারি, করাত কল, আসবাবপত্র তৈরি, সাবান, তেল, স্নো, পাউডার, চীনামাটি, এলুমিনিয়াম ও মেলামাইনের বাসনপত্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কুটির শিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড়, রেশমি বস্ত্র, মাটির পাত্র, কাঁসা-পিতলের দ্রব্য, বেত ও বাঁশের তৈরি দ্রব্য, চামড়া শিল্প, সাবান (বিশেষ করে কাপড় ধোয়া সাবান), শাঁখা, বই বাঁধাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ শিল্পে তেমন উন্নত নয়। জাতীয় আয়ে এ খাতের অবদান খুবই কম। দেশের শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খনিজ দ্রব্য :

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ নয়। অথচ শিল্পের উন্নতির জন্য পর্যাপ্ত খনিজ সম্পদ প্রয়োজন। বাংলাদেশে খুব বেশি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়নি। মূলধন ও কারিগরি জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে আমাদের খনিজ সম্পদ জরিপ, অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজ সন্তোষজনক নয়। আমদানির মাধ্যমে আমাদের খনিজ সম্পদের প্রয়োজন মেটাতে হয়। এদেশের উল্লেখযোগ্য খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চুনাপাথর, সিলিকা-বালু, চীনামাটি, পেট্রোলিয়াম, গন্ধক, তামা, কঠিন শিলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ব্লিচিং পাউডার, সিমেন্ট, চক, ইস্পাত, রং, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস জ্বালানি এবং সার শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। গন্ধক ও বারুদ দিয়াশলাই শিল্পে ব্যবহার করা হয়। কঠিন শিলা গৃহ নির্মাণ, রেললাইন, বাঁধ ও রাস্তাঘাট তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। কাচ, রং, অগ্নিরোধক ইট প্রভৃতি তৈরিতে সিলিকাবালু ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষিভিত্তিক। এদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। কৃষিজাত দ্রব্য ; ২। শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। খনিজ দ্রব্য।
- কৃষিজাত দ্রব্যকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–১। শস্য; ২। বন; ৩। পশুপালন ও ৪। মৎস্য।
- শিল্পজাত দ্রব্যকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– ১। বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্য, ২। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পজাত দ্রব্য ও ৩। কুটির শিল্পজাত দ্রব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৭.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

২। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৩। বাংলাদেশের বনভূমিকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪। বাংলাদেশে মোট জমির পরিমাণ কত কোটি হেক্টর?
ক. ১.২ কোটি হেক্টর খ. ১.৪ কোটি হেক্টর
গ. ১.৬ কোটি হেক্টর ঘ. ১.৮ কোটি হেক্টর

৫। বাংলাদেশে উৎপন্ন শিল্পজাত দ্রব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? এ দেশের শিল্পখাতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
২। বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্যসমূহকে কি কি ভাগে ভাগ করা হয়? এ দেশের বনজ সম্পদের বর্ণনা দিন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ৭.১ : ১। ক, ২। গ, ৩। খ, ৪। গ।

অনুশীলনী ৭.২ : ১। খ, ২। গ, ৩। ঘ, ৪। খ। ৫। খ